গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ২১-২৭ অক্টোবর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ পালন করুন

"... আমি মনে করি মার্ক্সবাদী দর্শন আয়ত্ত করতে না পারলে এবং এর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি না জন্মালে আজকের দিনে শোষিত মানুষ বর্তমান দুনিয়ার নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না এবং নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না।"

মার্ক্সবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক
—শিবদাস ঘোষ

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে হাহাকার মানুষের
অপদার্থ সরকারের বুলিই সার

আমেরিকায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর সাম্প্রতিক সভায় ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরতে অনেক কথা বলে এলেন দেশের অর্থমন্ত্রী। চেন্নাইয়ের বাজারে তাঁর হাসিমুখে সবজি কেনার ছবি খবরের কাগজের পাতা আলো করল। ভাবটা এমন যেন, কোথায় মূল্যবৃদ্ধি? কোথাও কোনও সমস্যা নেই তো! এদিকে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ গোটা বাজার তন্নতন্ন করে খুঁজে চলেছেন, কোথায় একটু কম দামে চাল-ডাল-সবজি-মাছের সন্ধান মেলে! তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে থলির এক কোণে পড়ে থাকা সামান্য জিনিস হাতে ঘরের পথ ধরছেন। সেখানে অপেক্ষা করে থাকা সন্তান-পরিজনদের মুখে কী করে দু'বেলা খাবার তুলে দেবেন, সেই দুর্ভাবনায় মুখ তাঁদের শুকনো।

বাস্তবিকই মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে। গত দু'মাসে চাল, গম, ডালের দাম বিপুল বেড়েছে। সবজির দামও জুলাই মাসের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। জ্বালানি গ্যাসের দাম হাজার টাকা ছাড়িয়ে গৃহস্থের নাগালের প্রায় বাইরে। এক লিটার কেরোসিন তেল দোকান থেকে কিনতে গেলে ১২০ টাকা নগদ গুনে দিতে হচ্ছে।

সব মিলিয়ে এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন জেরবার করে দিচ্ছে। এমনিতেই লকডাউনে কাজ হারিয়েছেন দেশের কয়েক কোটি মানুষ। বিরাট সংখ্যক মানুষ সামান্য মজুরিতে দিন গুজরান করছেন। বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, শিল্পোৎপাদনের হার

পাঁচের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ওড়িশায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্র, বেকারি সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

আসামে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে
এ আই ডি এস ও-র জয়

গুয়াহাটির কামাখ্যারাম বরুয়া কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে ছাত্র সংসদ গঠন করল এআইডিএসও। আসু এবং এবিভিপি নির্বাচন জিততে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও ছাত্রীরা তাদের প্রত্যাখ্যান করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করা ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষার দাবিতে সংগঠনের প্রচারে ছাত্রীরা সমর্থন জানানোর জন্যই এআইডিএসও প্রার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করে ছাত্রীরা।

রশ্মিতা চলিহা সভাপতি পদে, দীপিকা গগৈ সহসভাপতি পদে, রিশা আহমেদ আলোচনা সম্পাদক পদে, নাজমিন বেগম ক্রীড়া সম্পাদক পদে ও মেহেক বেগম গার্লস কমনরুম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

কেন্দ্রের শ্রম কোডের বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি-র বিক্ষোভ

১৪ নভেম্বর
কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা
বেলা ১২টা

কেন্দ্রীয় সরকার ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রম কোড এনেছে। শ্রমজীবী মানুষ এই শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে সোচ্চার। এই শ্রম কোড কেন শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী? কারণ এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের প্রায় সব অধিকার হরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোডের দশম অনুচ্ছেদের ৭৭ নং ধারায় বলা হয়েছে ৩০০-র কম শ্রমিক যুক্ত কারখানায় লে-অফ, ছাঁটাই এবং ক্লোজার করার জন্য মালিকদের উপযুক্ত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হবে না। তারা মনে করলেই ছাঁটাই করতে পারবে।

শ্রম কোডে ফ্যাক্টরির সংজ্ঞাও বদলে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান শ্রম আইনে ফ্যাক্টরির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত কারখানায় ১০ জন ও বিদ্যুৎ ছাড়া কারখানায় ২০ জন শ্রমিক থাকলে ফ্যাক্টরি বলে চিহ্নিত হবে এবং শ্রমিকরা ফ্যাক্টরি আইনের সকল সুযোগ পাবে। বর্তমান শ্রম কোডে তা উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ নির্ভর কারখানায় ২০ জন ও বিদ্যুৎ ছাড়া কারখানায় ৪০ জন শ্রমিক থাকলে তা কারখানা বলে পরিগণিত হবে। ফলে বহু মালিক এর সুযোগ নিয়ে যথাক্রমে ১৯ জন বা ৩৯ জন শ্রমিক দিয়ে কারখানা চালিয়ে শ্রমিকদের সমস্ত আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সংখ্যা ২০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ জন করা হয়েছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৫ জন থেকে বাড়িয়ে ১০ জন করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকরা হারাবে আইনের সুরক্ষা অধিকার ও মালিকরা পাবে ছাঁটাই ও শোষণ বঞ্চনার অবাধ স্বাধীনতা।

ফ্লোর ওয়েজ ব্যবস্থা কম মজুরি দেওয়াকে আইনসিদ্ধ করার ছল

আগে মজুরি ছিল তিন প্রকারের। (ক) মিনিমাম ওয়েজ (ন্যূনতম মজুরি)—যার কমে মজুরি দিলে কোনও শ্রমিক, পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। (খ) ফেয়ার ওয়েজ—কোনও মতে বাঁচার মতো মজুরি। (গ) লিভিং ওয়েজ—বাঁচার মতো মজুরি। এখন শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে আনা হয়েছে ফ্লোর ওয়েজ ব্যবস্থা। কারণ ১৯৫৭ সাল থেকে আইনত ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া

দুয়ের পাতায় দেখুন

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড

একের পাতার পর

বাধ্যতামূলক। যে মালিক ন্যূনতম মজুরির কম দেবেন তিনি আইনভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবেন। এই শাস্তির হাত থেকে মালিকদের বাঁচানোর জন্য এবং আইন অনুযায়ী আরও কম মজুরি শ্রমিকদের দেওয়ার জন্যই এই নতুন ফ্লোর ওয়েজের বিষয়টি কোডে এসেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করেছে ১৭৮ টাকা, যা ফ্লোর ওয়েজের নামান্তর। এই মজুরির ন্যূনতম মজুরির থেকে অনেক কম।

ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট বাস্তবে স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা

নতুন শ্রম কোড অনুযায়ী বর্তমান আইনের পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে শ্রমিকরা মালিকের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হবেন। এই চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের থাকবে না কাজের কোনও স্থায়িত্ব। মেয়াদ পূরণের আগে, চাকরি হারানোর ভয়ে শ্রমিকরা থাকবে শঙ্কিত। এই কারণে মালিকদের কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে পারবে না। মালিকরা ভাবছে, এর ফলে কারখানা হবে ইউনিয়ন মুক্ত। স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা, যা এতদিন বলবৎ ছিল তা ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট চালু করার ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে মালিকদের শোষণ অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকবে।

শ্রমিক ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে

শ্রম কোডে বলা হয়েছে, কোনও শিল্প বা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট করতে হলে ১৪ দিন আগে শ্রমিকদের নোটিস দিতে হবে। বর্তমান আইনে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ক্ষেত্র বাদ দিয়ে আর কোথাও ধর্মঘট করার জন্য নোটিস দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে সেই অধিকার খর্ব করা হল। শ্রম কোড চালু হলে যে কোন অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে শ্রমিকরা আইনত ধর্মঘট করতে পারবেন না। ধর্মঘট করলে বেআইনি ঘোষণা করা হবে এবং শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, শিল্প বিরোধ বিষয়ে সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু করা হলে—যতদিন আলোচনা চলবে ততদিন ধর্মঘট করার কোনও অধিকার শ্রমিকদের থাকবে না। মালিকপক্ষ ও তার তল্পিবাহক সরকার একে ব্যবহার করে যে কোনও অজুহাতে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে থাকবে। শ্রমিকরা আইনসম্মত ভাবে ধর্মঘটে যেতে পারবেন না। আরও বলা হয়েছে যে, অর্ধেকের বেশি শ্রমিক একযোগে ছুটি নিলে তা ধর্মঘট হিসেবে বিবেচিত হবে এবং মালিক এর বিরুদ্ধেশাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে।

শ্রম কোডের মাধ্যমে স্থায়ী নিয়োগের রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে

বর্তমান শ্রম কোড ব্যাপক ভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করার সিংহদরজা খুলে দিয়েছে। পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোডে এই স্থায়ী কাজের ধারণাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই কোডে কোর অ্যাক্টিভিটিতেও ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার মালিকদের দেওয়া হয়েছে। যা বর্তমান আইনের পরিপন্থী। পরিষেবা ক্ষেত্রেও যেমন ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স ইত্যাদিতে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর ঠিকা শ্রমিক মানেই হল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না এবং মজুরিও কমে যাবে।

শ্রম কোড পিএফ এবং পেনশন কমানোর পাকা ব্যবস্থা

সামাজিক সুরক্ষা কোডে বলা হয়েছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুরক্ষা শ্রমিকরা পাবে, কিন্তু তা ঐচ্ছিক হতে পারে। বলা হয়েছে, যদি কোনও কারখানার মালিক প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিমে না থাকতে চায় এবং মালিকপক্ষ ও সেই কারখানার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরা যদি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে তাদের ক্ষেত্রে পিএফ থাকবে না, তা হলে কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার তা অনুমোদন করতে পারে। পিএফ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পেনশন ভবিষ্যৎ সামাজিক সুরক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য প্রকল্প। এখানে সুদের হার নির্ধারণে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মতামতকেও বিবেচনা করা হয়। শ্রম কোডের মধ্য দিয়ে একে এভাবে ঐচ্ছিক করে দিলে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

আবার সামাজিক সুরক্ষা কোড অনুযায়ী কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার উভয়ের প্রদেয় মজুরি মূল বেতনের ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এতে কর্মচারীর পিএফ অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৪ শতাংশ করে কম টাকা জমা পড়বে। এর ফলে অবসরের সময় শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রাপ্য টাকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। এবং কমে যাবে পেনশনের টাকাও।

শ্রম কোড ইন্সপেক্টরদের ক্ষমতা খর্ব করেছে

শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে এতদিন পর্যন্ত যাঁরা ছিলেন ইন্সপেক্টর, এই কোড অনুযায়ী তাঁরা হয়ে যাবেন ইন্সপেক্টর কাম ফ্যাসিলিটেটর। এই শ্রম কোডে পরিদর্শন এবং যেকোনও জ্ঞাতব্য বিষয় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দেওয়া নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকলেই জানেন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ কখনওই বাস্তব পরিদর্শন অর্থাৎ ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত থেকে পরিদর্শনের বিকল্প হতে পারে না। বাস্তব পরিস্থিতি বা ঘটনাকে বুঝতে সশরীরে পরিদর্শন একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এখানে ইন্সপেক্টর কাম ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকাকে মূলত উভয়পক্ষের পরামর্শদাতা ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখা হয়েছে। বর্তমানে শ্রম আইন ভঙ্গকারী মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যতটুকু অধিকার ইন্সপেক্টরদের আছে— তাও খর্ব করা হয়েছে শ্রম কোডের মাধ্যমে। এর ফলে শ্রমিকদের উপর মালিকের শোষণ বঞ্চনা জুলুম আরও বাড়বে।

আন্দোলন রাজ্যের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও

শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী এই কালা শ্রম কোডের বিরুদ্ধে ১৪ নভেম্বর এআইইউটিইউসি কলকাতায় বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস জানান, শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই নয়, রাজ্যের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও এই বিক্ষোভ মিছিল। তিনি বলেন, এ রাজ্যেও চলছে বিজি প্রেস সহ নানা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া, ছাঁটাই, স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে ব্যাপক হারে চুক্তিতে নিয়োগ, পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ ও স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ। সরকারি ক্ষেত্রে বহু শূন্যপদ পড়ে আছে, কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। শিক্ষক, নার্স ও সরকারি কর্মচারী সহ যতটুকু নিয়োগ হয়েছে, তাতেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ চট এবং চা শিল্পে চলছে ভয়ঙ্কর শোষণ ও বঞ্চনা। বহু চটকল বন্ধ। চা শিল্পেও এখনও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। নেই বন্ধ চা বাগানগুলি খোলার উদ্যোগ। বন্ধ কারখানার শ্রমিকের আত্মহত্যা আজ নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকার হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক সহ অন্যান্য কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিচ্ছে না।

দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা আজ মোট শ্রমিক সংখ্যার ৯০ শতাংশের অধিক। তাঁদের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। তাঁদের জন্য নেই বাঁচার মতো মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতি সরকারের কোনও দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে বলে মনে হয় না। সমাজের জন্য উৎপাদনে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ পুঁজিবাদী সমাজে এঁরা ভীষণভাবে শোষিত ও উপেক্ষিত। এই সমাজে শ্রমিকের শ্রম ব্যবহার করে মালিকদের মুনাফার পাহাড় বাড়লেও বেশিরভাগ শ্রমিক শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। অশোক দাস বলেন, বিভিন্ন সংগঠিত, অসংগঠিত ও স্কিমে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায় ও আইনসঙ্গত দাবিগুলিকে নিয়ে এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর সমস্ত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের যুক্ত করে কলকাতায় এক বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই মিছিল ও ডেপুটেশনকে সফল করার জন্য তিনি সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোপালনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অসীম পণ্ডা ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শরৎ সাহিত্য বিষয়ক একটি আলোচনাসভার শেষে বাড়ি ফিরে সাথে সাথেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানতে এলাকায় বেরিয়ে পড়েন। পথেই তাঁর এই বেদনাময় মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনায় সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। কাকদ্বীপ শহরে দলের ওই আলোচনাসভায় বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পেয়েই তিনি ফোনে জেলা সম্পাদককে তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে বলেন। পাথরপ্রতিমা হাসপাতালে রাত্রি এগারোটায় জেলা কমিটির পক্ষে সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ময়নাতদন্তের পর কাকদ্বীপ হাসপাতাল চত্বরে কর্মী, দরদি, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদান করা হয়। এরপর শহরে শোকমিছিল বের হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেডস নন্দ কুণ্ডু, মাদার লস্কর, সুজিত পাত্র এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস, জৈমিনী বর্মন ও অন্যান্যরা। রাজ্য সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করেন জেলার অফিস সম্পাদিকা কমরেড প্রতিভা মিশ্র। এরপর বাসস্থান স্থলে তাঁর মরদেহ পৌঁছলে এলাকায় দলের বহু কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী শোকবিহ্বল অবস্থায় সমবেত হন। সেখানেই শবদাহ করা হয়।

কমরেড অসীম পণ্ডা স্কুলজীবনে পরিবার সূত্রে দলের ছাত্র সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। কৃতী ছাত্র হিসাবে ডায়মন্ডহারবার কলেজ এবং কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সময় অনেককেই দলের চিন্তায় প্রভাবিত করেন। এর পরে মেদিনীপুরের পালপাড়ায় বিএড পড়ার সময় অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় ছাত্র সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য হন। পরে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ছাত্র সংগঠনের কাজ করেন। এআইডিএসও-র রাজ্য কমিটির সদস্যও হন। যেখানেই সংগঠন গড়ার কাজে কমরেড অসীম পণ্ডা গেছেন সেখানেই তিনি জনগণের মধ্যে দলীয় সংযোগ গড়ে তুলতে সফল হয়েছেন। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠনেরও রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবির আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। মনীষী, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিজ্ঞান মনন গঠনে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করায় ছিলেন সর্বদা তৎপর। এলাকায় জুয়াখেলা রুখতে গিয়ে আক্রান্ত হন। কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা গঠিত হওয়ার পর গোপালনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক হয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে দলীয় সংগঠন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। সরল সাদাসিধে জীবন, কর্মী সংগ্রহ, দলের মতবাদ প্রচার ও তত্ত্বচর্চায় সর্বদা সক্রিয়, পরিবার আত্মীয় পরিজনদের দলীয় কাজে যুক্ত করে দৃঢ়চিত্তে দলের ঝান্ডা বহন করে চলা এক নিষ্ঠাবান কর্মীকে দল হারাল আকস্মিকভাবে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ৩০ অক্টোবর প্রয়াত কমরেড অসীম পণ্ডার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে গোপালনগরের আমন্ত্রণ হলে।

কমরেড অসীম পণ্ডা লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি বিধানসভায় ভুবনেশ্বরীর ভাসা অঞ্চলের প্রবীণ একনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড গৌর হালদার ডায়াবেটিসে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ৪ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

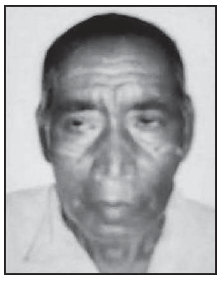

যৌবনকালে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মাধ্যমে দলের আদর্শের সাথে পরিচিত হন। পরিবারের সকল সদস্যকে দলের সমর্থকে পরিণত করেছিলেন। আচার আচরণে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি বহন করতেন। তাঁর মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড গৌর হালদার লাল সেলাম

তাইওয়ান ঘিরে চিন-মার্কিন দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব প্রকট

দীর্ঘ ন'মাস অতিক্রান্ত হলেও ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। ইতিমধ্যে প্রায় ১০,০০০ মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কত হয়েছে তার সঠিক হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। এর আগে গণদাবীতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, এই যুদ্ধ আসলে আমেরিকা এবং রাশিয়া এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্বেরই রাজনৈতিক প্রতিফলন। দু-পক্ষই ইউক্রেনের ওপর নিজেদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং এই যুদ্ধ তারই ফল। এরই মধ্যে সম্প্রতি তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের মধ্যে আরও একটি সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার পুরনো মার্কিন চাল এখন আর বিশেষ খাটছে না। তাই তারা এবার পূর্ব এশিয়ায় একটা নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করতে চাইছে। স্পষ্টতই, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো এবং রাশিয়া দু-পক্ষই নিজ নিজ দেশের সংকটগ্রস্ত অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের ফলে উভয় দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে তার থেকে তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উগ্র জাতিদম্ভের বিষে দেশবাসীকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে উভয় শক্তিই ইউক্রেন যুদ্ধকে যতদিন পারবে টেনে নিয়ে যাবে।

যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাইওয়ানকে আরও একটি রণাঙ্গনে পরিণত করতে চাইছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চিনও পালটা হুমকি দিচ্ছে। এই সব ঘটনাই 'সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়'— মহান লেনিনের এই শিক্ষাকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট

তাইওয়ান হল দক্ষিণ পূর্ব চিনের তটরেখা থেকে মোটামুটি ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এর দক্ষিণে হল বাসি চ্যানেল যা আবার লুজোন প্রণালীর একটি অংশ। অল্প যে ক'টি আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের মধ্য দিয়ে চিনের নৌবাহিনী তার নিজ দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে নিরাপদে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উন্মুক্ত সমুদ্রপথে পৌঁছতে পারে, লুজোন প্রণালী হল তাদের একটি। সপ্তদশ শতকে কুইং রাজবংশের শাসনকালে তাইওয়ান সম্পূর্ণভাবে চিনা অধিকারে আসে। কিন্তু ১৮৯৫ সালে প্রথম চিন-জাপান যুদ্ধে চিন পরাজিত হওয়ার ফলে জাপান তাইওয়ান দখল করে নেয়। ১৯৪৫ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে তারা তাইওয়ান আবার চিনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। চিনে তখন চিয়াং কাই শেক নেতৃত্বাধীন কুয়ো মিন তাং শাসনের আমল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে যখন মহান মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে বিপ্লব জয়যুক্ত হয় এবং চিনকে 'পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না' নামে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় তখন পরাজিত চিয়াং কাই শেক নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষী কুয়ো মিন তাং বাহিনী মূল চিন ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে তাইওয়ান দ্বীপে আশ্রয় নেয় এবং তারা দাবি করে যে, তাইওয়ান হচ্ছে প্রকৃত চিন দেশ। তাইওয়ানকে 'রিপাবলিক অফ চায়না' নাম দিয়ে চিয়াং সেখানে সামরিক শাসন কায়েম করে। প্রথম অবস্থায় চিয়াং-এর একনায়কত্বে একদলীয় বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু দিন পরে আংশিক রূপে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সমাজতান্ত্রিক চিন এবং তাইওয়ান উভয়েই একটি মাত্র চিন দেশকে স্বীকৃতি দেয়। তাইওয়ানে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকায় তার নিরসনের জন্য সমাজতান্ত্রিক চিনের রূপকার মহান মাও সে তুঙ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাইওয়ানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মেটানোর প্রস্তাব দেন এবং মিলিত চিন রাষ্ট্রের সরকারে চিয়াং কাই শেককে একটি প্রশাসনিক স্থান দেওয়ারও প্রস্তাব করেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী চিয়াং কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করেননি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল চিনের মূল ভূখণ্ডে পুনঃপ্রবেশ করে সমাজতন্ত্রকে উৎখাত করা। তাইওয়ান আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পেতে থাকে যার ফলে সে তার মাথাপিছু আয় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্রটাকে বাড়িয়ে দেখাতে পারে। এই সুযোগে আবার আমেরিকা প্রথম থেকেই তাইওয়ান প্রণালীতে তার রণতরীগুলো স্থাপন করে তাইওয়ানকে নিজ সামরিক প্রভাবের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে শুরু করে। ১৯৫৮ সালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে চিয়াং সমাজতান্ত্রিক চিনের জাহাজ চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে এবং মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি দ্বীপ মাৎসু ও কুইময়-তে গুপ্তচর নিয়োগ এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালানোর জন্য সশস্ত্র বাহিনীও পাঠাতে থাকে। চিয়াং মূল ভূখণ্ডে ক্ষমতা দখলেরও স্বপ্ন দেখত কারণ, তার ধারণা ছিল, সমাজতান্ত্রিক চিনে সাধারণ মানুষ অনাহারে আছে, তাই তারা চিয়াং বাহিনী দেশে প্রবেশ করলে তাদের স্বাগত জানাবে। চিয়াং তার নৌ বাহিনীর এক চতুর্থাংশকেই ওই এলাকায় স্থাপন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার কুখ্যাত সপ্তম নৌবহরকে ওই এলাকায় ঘাঁটি গাড়তে পাঠিয়েছিল এবং চিনের সঙ্গে যুদ্ধবাধলেই চিয়াং-এর সমর্থনে নেমে পড়ার নির্দেশও দিয়ে রেখেছিল। মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চিনকে তখন বাধ্য হয়েই এবং সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য পাল্টা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তাইওয়ান প্রণালী থেকে মার্কিন নৌবহর অপসারণ করার দাবি তুলতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনে চিন-মার্কিন কূটনৈতিক আলাপ আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত স্থগিত ছিল। তাইওয়ান প্রণালী সংক্রান্ত ঘটনার সময় চিন এই মুলতুবি আলাপ-আলোচনা আবার শুরু করার প্রস্তাব দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও এই সময়ে তাইওয়ানে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাল্টা সামরিক হস্তক্ষেপ করার হুমকি দেয়। চাপের মুখে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার যুদ্ধ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার নৌবহরকে সরিয়ে নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার সেক্রেটারি অফ স্টেটস জন ফস্টার ডালাস চিন সম্পর্কে মার্কিন নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনকে ধ্বংস করার জন্য যা করা দরকার আমেরিকা তাই করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' কিন্তু ১৯৭০ সালের মধ্যেই কানাডা এবং আরও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ সমাজতান্ত্রিক চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার পূর্ববর্তী নীতি থেকে সরে আসে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন ও জাতীয়তাবাদী চিন বা তাইওয়ান উভয় রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। ঐ বছরই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভোটে চিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং তাইওয়ানকে জাতিসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৭২ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন চিন সফরে যান এবং তাইওয়ান থেকে মার্কিন বাহিনী ও সমরসজ্জা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু **তার পর থেকে বিগত ৫১ বছর ধরে আমেরিকা মুখে 'একমাত্র চিন' হিসেবে গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনকেই কেবল স্বীকৃতি দিলেও তাইওয়ানের সঙ্গে অলিখিত সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।** মার্কিন আইন 'তাইওয়ান রিলেশনস অ্যাক্ট' (টিআরএ)-এর মাধ্যমে তারা সমাজতান্ত্রিক চিনের আগ্রাসন থেকে "দ্বীপরাষ্ট্রটির আত্মরক্ষার সংগ্রামে" সহায়তা দানের নামে তাইওয়ানকে আইনসঙ্গতভাবেই অস্ত্র বিক্রি করে থাকে। এতে একথাও বলা আছে যে, তাইওয়ানের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে বিপন্ন করার জন্য তার ওপর কোনও রকম বলপ্রয়োগ করা হলে আমেরিকা সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। বস্তুত, মুখে একটিমাত্র চিন দেশকে স্বীকৃতি জানালেও আমেরিকা তাইওয়ান সম্পর্কে একটি দুর্বোধ্য, এমনকি বলা চলে ষড়যন্ত্রমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে এবং তাকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করছে। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসেই তারা তাইওয়ানকে ৭৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছে।

কূটনৈতিক অবস্থান

মহান মাও সে তুঙ-এর অধিনায়কত্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন যখন 'একটি মাত্র চিনরাষ্ট্রের' নীতি ঘোষণা করেছিল, তার অর্থ ছিল, সমগ্র চিন ভূখণ্ডে একটিমাত্র সরকার থাকবে এবং সেটি হবে সমাজতান্ত্রিক সরকার। চিন সরকার ঘোষণা করেছিল, তাইওয়ান চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শীঘ্রই তাকে তার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার প্রথম এই নীতিকে স্বীকৃতি দেয়। ক্রমে জি-৭-এর অন্তর্ভুক্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোও 'এক চিন' নীতিকে মেনে নেয়। বর্তমানেও জি-৭-এর দেশগুলো যার মধ্যে আমেরিকা এবং জাপানও আছে, বলছে যে 'এক চিন' নীতি তারা এখনও স্বীকার করে এবং তাইওয়ান সম্পর্কে তাদের মূল নীতিরও কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইতিমধ্যে অবশ্য চিনের অভ্যন্তরেই একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। মহান মাও সে তুঙ এবং তার অল্প কিছুকাল পরেই চৌ এন লাই-এর মৃত্যুর পর শোধনবাদী দেং জিয়াও পিং চক্র চিনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং প্রতিবিপ্লবী পথে হাঁটা শুরু করে— যার পরিণতিতে অবশেষে ২০০৪ সালে প্রতিবিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে চিন এখন একটি আদ্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক চিনের 'এক চিন' নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী চিনের তাইওয়ান দখলের লক্ষ্য অভিন্ন নয়। সমাজতান্ত্রিক চিনের বক্তব্য ছিল, চিন নামে একটিই মাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকবে এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন সরকারই হবে সে রাষ্ট্রের একমাত্র বৈধ সরকার। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এজেন্ট এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর শত্রু চিয়াং শাসনাধীন তাইওয়ান সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল—তা চিনের অভ্যন্তরে কুয়ো মিন তাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যেকার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধেরই জের এবং সেজন্য তাকে চিনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলেই গণ্য করতে হবে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে চিয়াং-এর আঁতাত আটকানোর জন্য তারা সঠিকভাবেই 'এক চিন' নীতি ঘোষণা করেছিল।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী চিনের শাসকেরা পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক চিনের উত্তরাধিকারী সাজার ভান করছে কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে একটা নতুন সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ারে পরিণত হওয়া এবং ওই ভূভাগে মার্কিন আধিপত্য খর্ব করা। এরই জন্য তারা তাইওয়ানকে নিজেদের শক্তিপ্রদর্শনের ক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করতে চাইছে। পুরোপুরি মার্কামারা সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই চিনের বর্তমান শাসকেরা ক্রমাগতই তাদের প্রভাবাধীন এলাকা বাড়িয়ে চলেছে এবং ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রতি দ্বন্দ্বী শক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কুখ্যাত 'ব্রিকস' পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এবং তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর নিজেদের আধিপত্য ক্রমশই আরও শক্তপোক্ত ভাবে কায়েম করছে। চিন সাম্রাজ্যবাদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির পাল্টা হিসারে আমেরিকা, জাপান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে 'কোয়াড' ব্লক গঠন করেছে। তাইওয়ান সমস্যাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত বিচারে 'এক চিন' নীতির বৈধতা অনস্বীকার্য। ১৯৭২, ১৯৭৯ এবং ১৯৮২ সালে পরপর চিন-আমেরিকা উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত তিনটি যৌথ ঘোষণাপত্রেই চিনকে একটিমাত্র দেশ এবং তাইওয়ানকে চিনেরই একটি প্রদেশ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অপরপক্ষে তাইওয়ানের শাসকেরাও 'এক চিন' এর কথাই বলে। কিন্তু

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘আপনাদের কোনও বইয়ের চার লাইন যে একবার পড়েছে, সে ভুলতে পারবে না’

শারদীয় বুকস্টলে বলে গেলেন এক জন

ষষ্ঠীর সন্ধ্যে। উৎসবমুখী জনস্রোতের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এলেন বড়বাজারে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বুকস্টলের সামনে। উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ল তাঁর গলায়, ‘এই তো এসইউসিআই-এর স্টল। প্রতি বছর পুজোর সময় আপনাদের বই কেনা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।’ নতুন কী কী বই বেরিয়েছে খোঁজ নিয়ে সেগুলি কিনলেন। যাওয়ার আগে নিজের নাম, ফোন নম্বর দিয়ে বলে গেলেন, ‘এই উৎসবের মাঝেও আপনারা যেভাবে সারাদিন ধরে মানুষকে বুঝিয়ে রাজনৈতিক বইপত্র দেওয়ার চেষ্টা করেন,

কলকাতা

দিস ইজ এ জেনুইন স্ট্রাগল। কিপ ইট আপ।’

শারদোৎসবের জাঁকজমকের মধ্যে দলের কর্মীদের এই ‘জেনুইন স্ট্রাগল’ই মানুষের নজর কেড়েছে সর্বত্র। প্রতি বছরই এই সময়টিতে রাজ্য জুড়ে দলের আদর্শগত প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়। কর্মীরা পথচলতি মানুষকে দাঁড় করিয়ে বই কিনতে বলেন। বহু মানুষ নিজেরাই স্টলে এসে বই নিয়ে যান।

উনিশ-কুড়ির কলেজ পড়ুয়াদের একটা দল দাঁড়িয়েছিল শ্যামবাজার স্টলের সামনে। দলের এক কর্মী তাঁদের বই দেখতে অনুরোধ করলেন। ‘আসলে এখন তো মণ্ডপ দেখতে বেরিয়েছি, পরে নেব’ বলে এগিয়ে গেল প্রায় সকলেই। ওরই মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। স্টলের বইগুলো নাড়াচাড়া করার পর তুলে নিল মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের ‘শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য’। একটি ছেলে খানিকটা ইয়ার্কির ঢং এ বলল, ‘তুই সত্যিই কিনবি নাকি বইটা?’ মেয়েটি হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র খুব ভালো লাগে।’ হুগলির পাণ্ডুয়া স্টেশনের স্টল থেকে, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ একটি মূল্যায়ন’ বইটি নিয়েছিলেন একজন। বইটি পড়ে তিনি জানিয়েছেন, এ ধরনের মনীষী চর্চার উদ্যোগের সাথে যুক্ত হতে চান তিনি, কোনও সভা বা অনুষ্ঠান হলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। ভাগলপুর নিবাসী একজন বড়বাজারের স্টলে এসে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত সবগুলো বই সংগ্রহ করে নাম ঠিকানা দিয়ে গেলেন। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে দলের কিশোর সংগঠন ‘কমসোমল’-এর সদস্যরা স্টল করে। সেই স্টল থেকে একটি বই কিনলেন এক মহিলা। বললেন, ‘ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুজোর দিনে হাতে মনীষীদের বই নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এ জিনিস একমাত্র তোমাদের দলেই সম্ভব। তবে ঠিকই করছ তোমরা, ওদের মানুষ করতে হলে এই শিক্ষা ছোট বয়স থেকেই দিতে হবে।’

দলের রাজনীতি, মতাদর্শ জানার, বিভিন্ন বিষয়ে দলের বক্তব্য শোনার একটা আলাদা আগ্রহ প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়েছে এবার। সংসদীয় দলগুলোর নির্লজ্জ মিথ্যাচার, ক্ষমতার লোভ, নীতিহীনতা দেখে দেখে জনগণ ক্লান্ত, হতাশ, রাজনীতিবিমুখ। কিন্তু এটাই একমাত্র চিত্র নয়। এর মধ্যেও কিছু লোক বরাবরই থাকেন যাঁরা পথ খোঁজেন। সমাজের নানা সমস্যা তাঁদের ভাবায়। মুক্তি কোন পথে অনুসন্ধানের দিকে ঠেলে। তাঁদেরই অনেককে দেখা গেল এবারের স্টলে। বেছে বেছে রাজনৈতিক বই, মার্কসবাদের আলোচনা, বিশ্লেষণ নিয়ে গেছেন তাঁরা স্টল থেকে।

পুজোর দিনগুলোয় সকালে বাড়ি বাড়িও বই নিয়ে যান দলের কর্মীরা। এমনই কিছু জন গিয়ে ছিলেন উত্তরবঙ্গের সুশ্রুতনগরের একটি বস্তিতে। রাজ্যের অসংখ্য বস্তির মতোই উৎসবের রোশনাই সেখানে ঢাকতে পারেনি মানুষগুলোর অভাব, ক্লেদাক্ত জীবনের অন্ধকার। কর্মীদের হাতে বই দেখে ঝগড়া থেমে গেল এমনই এক একচিলতে ঘরে। পরিবারের একজন বললেন, বই যে দেখছ, বই কেনার পয়সা আছে তোমার? মানুষটি একটা বই তুলে নিয়ে বললেন, ‘বিদ্যাসাগরের বই কেনার জন্য পয়সা আছে।’ উত্তরবঙ্গেরই একটি স্টলে এক বিএসএফ জওয়ান বাইক থামিয়ে স্টলে এলেন। ‘সব শাসকই দুর্নীতিগ্রস্ত কেন’ এবং ‘কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল’ বই দুটো কিনে ব্যাগে ভরে নিলেন। হেসে বললেন, ‘লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ব।’ বিভিন্ন স্টলে ‘চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব’, ‘মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে’র মতো বই নিয়ে গেছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এক অধ্যাপক দলের ছাত্রকর্মীদের সাথে ছবি তুলে বন্ধুদের পাঠালেন হোয়াটসঅ্যাপে। বলে গেলেন, ‘তোমাদের মতো ছাত্র-যুবকরাই সমাজে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে, তোমরাই পারবে।’ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকাল ট্রেনে বই বিক্রি করছিলেন কর্মীরা। স্থানীয় কলেজের এক অধ্যাপক প্রাথমিকে ইংরেজি চালুর দাবিতে দলের আন্দোলনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বই নিলেন। কর্মীদের ডেকে দাঁড় করালেন স্থানীয় হাসপাতালের এক ডাক্তার। বললেন, ‘কই, আমায় বই দিলে না?’

বড়বাজার স্টলের কাছে ট্যাক্সির গতি একটু কমিয়ে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে ধরলেন এক ট্যাক্সি ড্রাইভার। বলে গেলেন, এটা স্টল খরচের জন্য রাখুন কমরেড। বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রমজীবী মানুষ প্রান্তিক মানুষ এভাবেই জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনে নিচ্ছেন এই দলের সংগ্রামী রাজনীতিকে, বেকারি-মূল্যবৃদ্ধির মতো জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর উত্তর খুঁজছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বইপত্রে।

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে একজন নিজের দোকান বন্ধ রেখে তার বারান্দায় স্টল করতে দিয়েছেন, পাঁচদিন ধরে স্টলের সব কর্মীদের তিন বেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এক তাঁতশিল্পী স্টল থেকে ‘বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়’ সহ বেশ কয়েকটি বই কিনে বললেন, হাজার কাজের মধ্যেও নিজে এবং অন্যদের নিয়ে গণদাবী পড়ি। প্রতিবার পুজোর সময় স্টল থেকে বই কিনি। দক্ষিণ কলকাতার হরিনাভিতে পুজো কমিটির এক সদস্য স্টলে এসে বললেন, পরের বার থেকে আপনাদের স্টলের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমরাই করে দেব। আদর্শহীনতার মরুভূমিতে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কর্মীদের আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি, নিষ্ঠা এভাবেই মরূদ্যানের মতো টেনেছে মানুষকে। শুধু বই নিয়েই নয়, কোথাও কর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে কোথাও স্টলে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে বা স্টল চালানোর জন্য অর্থসাহায্য করে সর্বতোভাবে পাশে থাকতে চেয়েছেন মানুষ, তাঁদের এই ভালোবাসা শ্রদ্ধা প্রেরণা জুগিয়েছে দলের কর্মীদের।

এক পরিচিত বামপন্থী কর্মী এগিয়ে এলেন কলকাতার হাতিবাগান স্টলে। বইপত্র দেখার পর একটু চুপ করে থেকে বললেন, যাদের ওপর ভরসা করে ভাল কিছু করব বলে রাজনীতিতে এসেছিলাম, তারা বেশিরভাগই পাল্টে গেছে। এবার একটু অন্য ভাবে ভাবতে হচ্ছে। বেছে বেছে বেশ কিছু বই নিয়ে গেলেন। এমনই আরেকজনকে বই দেখতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, আমিও সারা দিন স্টলে ছিলাম। কিন্তু আমাদের তো গল্প করেই দিন কেটে গেল। আপনারা যেভাবে পরিশ্রম করে, মানুষকে বুঝিয়ে বই দিচ্ছেন, একটা বামপন্থী দলের এমনটাই করা উচিত। আমার দলে অনেক বলেছি, কিন্তু ওরা আর এসব করবে না। তারপর ‘কমরেড শিবদাস ঘোষের গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই’, ‘সোসাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করেই বিপ্লবী দলকে এগোতে হয়’, ‘যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও আমাদের কর্তব্য’ সহ বেশ কিছু বই নিয়ে ফোন নম্বর দিয়ে গেলেন।

বর্ধমান শহর

উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ির বুক স্টলে এসে বই নিয়ে একজন বললেন, নেতাজির দল ভেবে ফরোয়ার্ড ব্লকে ছিলাম, পরে কিছুদিন সিপিএম করেছি। এখন আর কোনও দলের সাথেই নেই। নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে গেলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এক জায়গায় স্টলের পাশে অন্য একটি বামপন্থী দলের স্টলে বসা এক কর্মী এসইউসিআই(সি) দলের স্টলে এসে বইপত্র দেখলেন অনেকক্ষণ, বেশ কিছু বই নিলেন। এক প্রাক্তন বাম যুব কর্মী কমরেড শিবদাস ঘোষ এর রচনাবলি, কমরেড প্রভাস ঘোষ এর লেখা বেশ কিছু বই নিয়ে বললেন, ‘আমাদের দল তো এখন মিলিট্যান্টআন্দোলন থেকে সরে গেছে। আপনারা আন্দোলনে আছেন, প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন।’ এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের বহু স্টলেই। এমনই প্রাক্তন শাসক দলের কর্মী, ছাত্র, সমর্থক, বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ স্টলে এসে বই নিয়েছেন। অর্থাৎ আজও যাঁরা বামপন্থার প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধাশীল, সিপিএম সহ অন্যান্য দলের ভোটসর্বস্ব রাজনীতিকে যাঁরা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারছেন না, সেই মানুষগুলো আকৃষ্ট হচ্ছেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের প্রতি, একমাত্র আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন এখানেই। মেদিনীপুরের মদনচকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দলের কর্মীদের বললেন, আপনাদের কোনও বইয়ের চার লাইন যে একবার পড়েছে, সে ভুলতে পারবে না। একই সুর শোনা গেল কলকাতার একটি স্টলেও। একজন বই নিয়ে বললেন, আপনাদের বই একবার পড়লে বারবার খুঁজতে হয়। প্রচলিত অর্থে লোক টানার মতো একটি বইও থাকে না এই দলের স্টলে, অথচ এত মানুষ আসেন আকৃষ্ট হন কীসের টানে? আসলে, বইগুলোর মধ্যে রাজনীতির তত্ত্বের বাইরেও যে মানবিক মূল্যবোধ ও উন্নত নৈতিকতার সন্ধান মানুষ পান, তা গভীর ছাপ রেখে যায় সংবেদনশীল মনে।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ‘মনে রাখবেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হোক, আর যে কোনও আদর্শবাদই হোক, শুধু কতকগুলো কথার মধ্যে কোনও আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে না। যে কোনও আদর্শের আসল পরিচয় বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত, নীতিগত এবং রুচিগত মানের মধ্যে। ... তাই মার্কস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ পর্যন্ত বা যাঁরাই হাতেকলমে বিপ্লব করেছেন, সকলেই একটা কথার উপর জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে, কোনও আদর্শ বড় হলেই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না, যদি সেই আদর্শকে রূপায়িত করবে যে মানুষগুলো তারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার মতো বড় মানুষ এবং উন্নত চরিত্রের না হয়।’ এই উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে গড়ে ওঠা বিপ্লবী রাজনীতিই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর মূল শক্তি, যা অনিবার্যভাবে মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা আদায় করে নেয়। চারপাশের অবক্ষয় এবং অনিশ্চয়তার মাঝেএই দলের বুক স্টল এত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই বিপ্লবী রাজনীতির উষ্ণ স্পর্শেই। দলের বইগুলো হয়ে ওঠে সংগ্রামী মানুষের প্রেরণা, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের রসদ।

রাজ্যপালের কাছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের দাবি

দ্রুত অর্থ মঞ্জুর করে অবিলম্বে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরুর দাবিতে ২৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে প্রকল্পের ব্যয় কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারই বহন করবে বলে সম্মত হয়েছে। তাঁদের দাবি, দুই সরকার দ্রুত অর্থ মঞ্জুর করে আগামী বর্ষার পূর্বে প্রকল্পটির রূপায়ণে হাত দিক।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ছাত্ররা রাজপথে

পাটনা, বিহার

কলকাতা

মধ্যপ্রদেশ

প্রকাশিত হয়েছে

এ আই ডি এস ও-র দিল্লি রাজ্য সম্মেলন

২৫ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির নানা ক্ষতিকারক দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিবেক সচদেব, কমরেডস সচিন জৈন, দীনেশ মহন্ত, শ্রেয়া, সুমন প্রমুখ। সম্মেলনে ২০ সদস্যের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। অনির্বাণ ভৌমিক সভাপতি এবং শ্রেয়া সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

অপদার্থ সরকারের বুলিই সার

একের পাতার পর

শূন্যেরও নীচে নেমেছে। অর্থাৎ আরও বেশি করে বন্ধ হচ্ছে কল-কারখানা। কাজ চলে যাচ্ছে আরও বেশি শ্রমিকের। গরিবির অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে আরও অসংখ্য পরিবার। বাড়ছে অনাহারী, অর্ধাহারী মানুষের সংখ্যা। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে সামনে এসেছে বিশ্বক্ষুধা সূচকের রিপোর্ট, যেখানে দেখা যাচ্ছে গত বছরের চেয়ে আরও অনেকটা নেমে গিয়ে ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ১০৭ নম্বরে। এর মানে হল, অপুষ্টি, শিশুদের বৃদ্ধি ও উচ্চতায় ঘাটতি এবং শিশুমৃত্যুর হার ক্রমাগত বীভৎস চেহারা নিচ্ছে ভারতে।

কিন্তু দেশে তো একটা জবরদস্ত সরকার আছে, যার নেতৃত্বে আছেন ৫৬ ইঞ্চি ছাতিবিশিষ্ট এক 'বিকাশপুরুষ'! তাহলে দেশের মানুষের এই হাল কেন? তাদের এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার জন্য কী ভূমিকা পালন করছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার? বাস্তবে দেশের ধনকুবের পুঁজিপতিদের মুনাফা আকাশছোঁয়া করে তোলার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্বও তারা পালন করেনি, করছেও না।

মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে জ্বালানি তেলের চড়া দামকে দায়ী করা হচ্ছে। এটা ঠিকই, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে খাদ্যপণ্য সহ সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ে। প্রশ্ন হল, পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর জন্য সরকার কী চেষ্টা করেছে? মানুষকে ধোঁকা দিতে ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করছেন নেতা-মন্ত্রীরা। অথচ তথ্য দেখাচ্ছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, বছরের শুরুতেই দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশের উপরে। এ কথা এখন আর গোপন করার উপায় নেই যে, পেট্রল-ডিজেলের চড়া দামের পিছনে রয়েছে চড়া হারের শুল্ক ও সেস, যা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চাপিয়েছে যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই। নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দামে মানুষ যখন নাজেহাল, তখন নাম-কা-ওয়াস্তে একবার শুল্ক সামান্য কমিয়ে দায় সেরেছে কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই। যুদ্ধ পরিস্থিতিকে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য দায়ী করছেন যে নেতা-মন্ত্রীরা, তাঁরা তো কই একবারও বলছেন না যে, যুদ্ধের এই সময়েই রাশিয়া থেকে জলের দরে তেল কিনে সেই তেল চড়া দামে দেশের মানুষকে কিনতে বাধ্য করে তেল-কোম্পানির কর্পোরেট মালিকদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলেছেন তাঁরা! এভাবেই সাধারণ মানুষকে জীবনযন্ত্রণায় জেরবার করে নির্লজ্জের মতো মালিকদের পদলেহন করে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ থাকলে বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের দাম তাদের নাগালের মধ্যে রাখা সরকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। দেশে গত কয়েক বছর ধরে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে সঞ্চয় করে রাখা চাল-গমের চাপে এফসিআই-এর গুদামগুলি গত দু'বছরই উপচে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এ হেন আকাশছোঁয়া দাম কেন? এর পিছনে রয়েছে খাদ্যপণ্যের বাজারটির নিয়ন্ত্রণ লাগামহীন ভাবে বেসরকারি মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সরকারি নীতি। সরকারের পেটোয়া বৃহৎ পুঁজির মালিকরা খাদ্যশস্যের বাজারটির দখল নিয়ে নেওয়ার ফলে একদিকে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে চাষিরা হাহাকার করছেন, ঋণের বোঝা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। পাশাপাশি চাল-গম কিনতে পকেটের টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষ। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক পরিমাণে খাদ্যশস্য সস্তায় কিনে গুদামে মজুত করে রাখছেন বৃহৎ পুঁজিপতিরা এবং কৃত্রিম ভাবে চাহিদা তৈরি করতে এমন পরিমাণে বাজারে তা জোগান দিচ্ছেন, যাতে দাম হয়ে পড়ছে আকাশছোঁয়া।

সরকার যদি সত্যিই চায়, এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তা তারা করবে না। কারণ, পুঁজিপতিদের বদান্যতায় সরকারে বসে তার প্রধান কাজ হল মালিকদের মুনাফার স্বার্থ রক্ষা করা, তাতে জনসাধারণ যদি না খেয়ে মরে তো মরুক। এটাই হল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'-এর আসল চেহারা। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও কম লজ্জাজনক নয়। পরিসংখ্যান বলছে, গত দু'মাস ধরে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সরকারে বসেই তৃণমূল সরকার প্রবল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তৈরি করেছিল একটি টাস্ক ফোর্স। বলা হয়েছিল, এই টাস্ক ফোর্স নিত্যপণ্যগুলির দামের ওঠানামায় কড়া নজর রাখবে। ভয়ঙ্কর এই মূল্যবৃদ্ধির সময়েও সেই টাস্ক ফোর্সের কোনও অস্তিত্ব নজরে পড়ছে না। পাশাপাশি, পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর নামে মাত্র একবার সরকারি প্রাপ্য সামান্য কমিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো করেই দায় ঝেড়ে ফেলেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

বড় পুঁজির মালিক যে সব আড়তদার জেলায় জেলায় বেআইনি শস্যভাণ্ডার তৈরি করে রেখেছে, ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের তাদের বিরুদ্ধে সামান্য মুখ খুলতেও দেখা যায় না। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো, রাজ্য সরকারেরও টিকি বাঁধা রয়েছে প্রবল ক্ষমতাধর এই সব পুঁজিপতিদের কাছে। জনগণের খেতে পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে তাই আজ কোনও সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশের সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়ে আকাশকুসুম ভাষণ দিচ্ছেন, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে মেলা-খেলায় মনোনিবেশ করছেন।

অন্যায় শোষণের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বহাল রয়েছে দেশের এইসব সরকার, সেই ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রতি তাদের এই নির্মম দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বাভাবিক। বেকারি-গরিবির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির দুঃসহ আগুনে পুড়তে থাকা খেটে-খাওয়া মানুষকে বুঝতে হবে, শুধু সরকার পাল্টে এই জীবনযন্ত্রণা দূর করা যাবে না। তার জন্য চাই এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চলতেই একের পর এক গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত গণআন্দোলন, যার চাপে সরকারগুলি বাধ্য হবে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের কালো মেঘ

তিনের পাতার পর

তাদের ‘রিপাবলিক অফ চায়না’ সংবিধান (যা কুয়ো মিন তাং সরকার ১৯৪৭ সালে নানজিং-এ পাশ করিয়েছিল) অনুযায়ী ‘এক চিন’-এর অর্থ হল, চিনের মূল ভূখণ্ড এবং তাইওয়ান উভয়কে যুক্ত করে গোটা চিন দেশের ওপর একমাত্র ‘রিপাবলিক অফ চায়না’ সরকারের সার্বভৌমত্বকেই স্বীকার করতে হবে।

চিন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দাবি করছে, ১৯৯২ সালে চিন কমিউনিস্ট পার্টি ও তাইওয়ানের তৎকালীন শাসক কুয়োমিনতাং দলের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয়েছিল তারই ভিত্তিতে তাইওয়ানকে দেখতে হবে। কিন্তু তাইওয়ানের বর্তমান শাসকেরা এই দাবি মানতে রাজি নয়। তাদের মতে ওই বোঝাপড়ায় তাইওয়ানের বৈধ অস্তিত্বের প্রশ্নে কোনও কথা হয়নি। স্পষ্টতই আমেরিকা ও চিন উভয়ের তাইওয়ানে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী চিন বর্তমানে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। কাজেই আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মতো তারও অর্থনীতির সামরিকীকরণের জন্য যুদ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ইউরোপের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য কার থাকবে তাই নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। একই ভাবে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আধিপত্য নিয়ে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী চিনের সঙ্গে।

তাইওয়ান

তাইওয়ানের অর্থনীতি

আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পেয়ে তাইওয়ান বর্তমানে একটি অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। তার বাৎসরিক পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৭৮৬ বিলিয়ন ডলার এবং পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাইওয়ান সবসময় দেশ হিসেবে আমেরিকার স্বার্থ এবং সেদেশের অর্থনৈতিক সুবিধেকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। গত বছরে তাইওয়ান আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যকারী অষ্টম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে তাইওয়ানের গুরুত্ব অপরিসীম এই কারণে যে, সারা বিশ্বের নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় ইলেকট্রনিক পণ্য যেমন, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ঘড়ি, ভিডিও গেমসের উপকরণ বা অন্যান্য যা কিছুই কম্পিউটার চিপ পরিচালিত সেগুলোর অধিকাংশই উৎপাদন করে তাইওয়ান।

সারা পৃথিবীর ইলেকট্রনিক পণ্য বাজারের অর্ধেকেরও বেশি তাইওয়ানের একটিমাত্র কোম্পানি ‘তাইওয়ান সেমিকনডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি’ বা টিএসএমসি দখল করে রেখেছে। বিশ্ববাজারে চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে সেমিকনডাক্টর শিল্প গড়ে তোলা আমেরিকার বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন। এইজন্য টিএসএমসি আমেরিকায় চিপ ফ্যাক্টরি তৈরি করতে ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এদিকে তাইওয়ান থেকে চিন বর্তমানে বছরে ১২৬.২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য কিনছে যা তাইওয়ান থেকে আমেরিকায় রপ্তানি বাণিজ্যের (৬৫.৯ বিলিয়ন) প্রায় দ্বিগুণ। চিনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদক কোম্পানিগুলো তাইওয়ান থেকে আমদানি করা সেমিকনডাক্টর প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল হলেও তাইওয়ানকে আবার ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্য চিন থেকেই আমদানি করতে হয়। সুতরাং চিনের সঙ্গে শত্রুতা করতে গেলে তাইওয়ানের অর্থনীতিকে বড় রকমের মাশুল দিতে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাইওয়ান প্রণালীতে কোনও সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে চিপ বাণিজ্যের চেন ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বিঘ্নিত হলে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও চিন উভয় দেশেরই অর্থনীতি ভালোরকম ধাক্কা খাবে, এবং তাইওয়ানের অর্থনীতি যে ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়বে সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

ভারত এখনও ‘নিরপেক্ষ’ হয়ে রয়েছে কেন?

সাধারণভাবে ‘এক চিন’ নীতিকে সমর্থন জানানোর জন্য ভারত আজ পর্যন্ত তাইওয়ানের সঙ্গে কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেনি। কিন্তু কূটনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ‘ভারত-তাইপেই অ্যাসোসিয়েশন’ (আইটিএ) নামে তাইপেই শহরে ভারত সরকারের একটা দপ্তর আছে। একজন অভিজ্ঞ কূটনৈতিক অফিসারকেই এই দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। আবার দিল্লিতেও ‘তাইপেই অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র’ নামে তাইওয়ানের একটা দপ্তর আছে। এই দুই দপ্তরই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে।

এইভাবে ভারত সরকার কার্যত চিন ও তাইওয়ান উভয় দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ভারত ও চিন উভয় দেশেরই সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে পুরোনো সীমান্ত সমস্যা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ভূরাজনৈতিক প্রভাবাধীন এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত বেধেছে। এই কারণে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী খোলাখুলিভাবেই আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া আরও শক্তপোক্ত করছে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে শুধু এশিয়া নয়, গোটা বিশ্বের মধ্যেই একটি সুপারপাওয়ার হিসেবে উঠে আসার চেষ্টা করছে। ভারত সরকার এমনকি আমেরিকার বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারিকে ভারতের হয়ে তাইপেইতে দৌত্য করতে পাঠিয়েছে।

২০১৬ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি তার দুজন সাংসদকে নির্দেশ দিয়েছিল নবনিযুক্ত তাইওয়ান প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারচুয়াল মোডে উপস্থিত থাকতে। অবশ্য তা সত্ত্বেও সম্প্রতি তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেইতে আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের স্পিকার ন্যানসি পেলোসির সফরকে কেন্দ্র করে চিন আমেরিকার মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষাবলম্বন করেনি এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনও বিবৃতিও দেয়নি।

তাইওয়ানে বর্তমান যুদ্ধ উত্তেজনার কারণ

হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের স্পিকার আমেরিকান প্রশাসনে গুরুত্বের মাপকাঠিতে তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এত উচ্চ পর্যায়ের কোনও আমেরিকান প্রশাসক তাইওয়ান সফর করেননি। ন্যানসি পেলোসির গত বছর মার্চেই এই সফর করার কথা ছিল। কিন্তু কোভিডের জন্য তা স্থগিত রাখা হয়। চিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বারণ করেছিলেন যে, তাঁরা যেন ন্যানসিকে তাইওয়ান সফরে না পাঠান— পাঠালে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। এই অনুরোধ পাঠানোর কয়েক দিনের মধ্যেই আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমেরিকা ন্যানসিকে তাইওয়ানে পাঠায়। এর ফলে চিন অত্যন্ত রুষ্ট হয়। কারণ, চিন সাম্রাজ্যবাদের চোখে উচ্চ পর্যায়ের কোনও আমেরিকান প্রশাসকের তাইওয়ান সফরের অর্থ তাইওয়ানের স্বাধীনতার দাবিতে আমেরিকার সমর্থন জোগানো। পশ্চিম দুনিয়া এবং ভারতের সংবাদমাধ্যম শুধুমাত্র চিনের বিরুদ্ধে একতরফা প্রচার চালাচ্ছে যে, কেবলমাত্র চিনই তাইওয়ানের চারধারের সমুদ্রে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে, দ্বীপটির আকাশের উপর দিয়ে মিসাইল ছুঁড়ছে, আকাশসীমা লঙ্ঘন করে জেট প্লেন ওড়াচ্ছে। কিন্তু যে কথাটা তারা চেপে যাচ্ছে, তা হল, মার্কিন নৌবাহিনীর সপ্তম নৌবহর এই বছরেই এখনও পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে একটা করে মিসাইল বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ তাইওয়ান প্রণালীতে পাঠিয়েছে। মার্কিন নৌবহরের সর্বোচ্চ কম্যান্ড ‘রিম অফ দি প্যাসিফিক অ্যামফিবিয়াস অ্যাসল্ট ট্রেনিং’ ১৭০টি বিমান, ৩৮টি যুদ্ধজাহাজ, চারটি সাবমেরিন এবং জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত মোট ২৫ হাজার সৈন্য সেখানে মোতায়েন করেছে। এ ছাড়াও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আরও প্রায় ১৯টি দেশকে প্রতীকী অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ‘রিমপ্যাক’ হল পৃথিবীর বৃহত্তম নৌ-সেনাবাহিনীর সম্মিলন। তাদের কম্যান্ডার বলেছেন, চিনা সামরিক বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করাই তাদের উদ্দেশ্য। ন্যানসি পেলোসির তাইওয়ান সফরের সময়ও এই আগ্রাসী সামরিক মহড়া চালু ছিল। আমেরিকা স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় এই বিপুল সমরসজ্জাকেও রুটিন এবং দৈনন্দিন মহড়া বলেই বিবৃতি দিয়েছে। এও জানা গেছে যে, গত মার্চ মাসেই আমেরিকার উচ্চপদস্থ সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা তাইওয়ান সফর করেছেন। তার পর পরেই এপ্রিল মাসে সব মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তের প্রধান কারিগর লিন্ডসে গ্রাহামের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ, বিচারবিভাগ ও অর্থমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের একটি বড় দল তাইওয়ানে আসে। গত ২১ আগস্ট আসে ইন্ডিয়ানা রাজ্যের গভর্নর এরিক হলকম্বের নেতৃত্বে তৃতীয় আর একটি দল। হলকম্বের দপ্তরের একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সফরটির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সর্বাধিক সেমিকনডাক্টর উৎপাদক দেশ তাইওয়ানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করা। কিন্তু সারা বিশ্বে আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে একের পর এক দেশের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় ওস্তাদ কুখ্যাত মার্কিন বিদেশনীতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মানুষ মাত্রেই জানেন যে, এই আপাত নিরীহ বিবৃতিটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য এই সব একের পর এক প্ররোচনা সৃষ্টি করে চিনকে পালটা পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করা। চিনও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামরিক মহড়া শুরু করেছে এটা দেখানোর জন্য যে, চিনা সামরিক বাহিনী দ্বীপটাকে অবরুদ্ধ করে রাখার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ধরে। আর এর ফলেই ইউক্রেনের যুদ্ধ পুরোদমে চলতে চলতেই তাইওয়ানের আকাশে একটি নতুন যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে।

অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং যুদ্ধ বাধানো সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য

আমরা বিভিন্ন সময় বারবার দেখিয়েছি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের অর্থনীতি তার নিজের নিয়মেই প্রতি মুহূর্তে তীব্র থেকে তীব্রতর সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং এই চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে কৃত্রিম উপায়ে যথাসম্ভব কিছুটা চাঙ্গা করার মরিয়া প্রচেষ্টা থেকেই প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশই অর্থনীতির সামরিকীকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সামরিকীকরণের ফলে কৃত্রিমভাবে কিছু শিল্প সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে অর্থনীতিও খানিকটা চাঙ্গা হয়। যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে আবার প্রচুর পরিমাণে নতুন সামরিক উপকরণ উৎপাদন করতে হয়। এর ফলে অর্থনীতি কিছুটা তেজি হয়। এইজন্যই সাম্রাজ্যবাদ সবসময় যুদ্ধ উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে এবং স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাবে হলেও যেখানে যতটুকু সম্ভব যুদ্ধবাধানোর ফিকির খোঁজে। এই কারণেই আমেরিকা, রাশিয়া, বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিগুলো, ভারত সহ সব সাম্রাজ্যবাদী দেশেই অর্থনীতির সামরিকীকরণ বর্তমানের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ামণি আমেরিকা তো দীর্ঘদিন আগে থেকেই যুদ্ধ চক্রান্তকেই তার প্রধানতম আন্তর্জাতিক নীতিতে পরিণত করে ফেলেছে এবং একটার পর একটা দেশে ‘দুঃশাসনের অবসান’ করে গণতন্ত্র রপ্তানি করার অজুহাতে যুদ্ধ বাধিয়ে চলেছে। তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও ন্যানসি পেলোসি বলেছেন, ‘তিনি এমন একটা সময়ে সফর করছেন যখন বিশ্বকে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে।’ আর তাদের পেটোয়া বুর্জোয়া মিডিয়াও এইসব কথাগুলোর সপক্ষে অনর্গল মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পত্রিকা ‘পাবলিকো’ ইরাক আক্রমণ সহ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সবকটি যুদ্ধচক্রান্তকে সমর্থন যুগিয়ে গেছে। ফক্স নিউজ, সিএনএন, এপি, দি নিউ ইয়র্ক টাইমস, দি ওয়াশিংটন পোস্ট ধনকুবেরদের পরিচালিত সবকটি মিডিয়াই আমেরিকান যুদ্ধাস্ত্রশিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মধ্যপ্রাচ্যের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার দখল করার লক্ষ্যে সেখানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে রাখতে চায়। তাদের সব থেকে বড় বন্ধু উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েলকে দিয়ে প্যালেস্টাইনের ওপরও তারা ক্রমাগত ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষকে হত্যা করছে। বিভিন্ন দেশের

সাতের পাতায় দেখুন

ডায়মন্ডহারবারে মহিলা সম্মেলন

এআইএমএসএস-এর প্রথম ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৯ সেপ্টেম্বর। দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্তের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সেখান থেকে মহিলারা বিজয়গঞ্জ বাজার পর্যন্ত মিছিল করেন। দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাধবী প্রামাণিক।

নারী নির্যাতন-খুন-ধর্ষণ এবং মদের প্রসার ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করা, বিলকিস বানোর গণধর্ষণকারী ১১ দুষ্কৃতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখা, ইরান সরকারের নারী স্বাধীনতায় বাধা না দেওয়া ইত্যাদি দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মেলন থেকে সুলেখা খামারু এবং মনোরমা হালদারকে যথাক্রমে সভানেত্রী ও সম্পাদক করে ১৪ জনের জেলা কমিটি ও ৩১ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

একবালপুর থানায় ডেপুটেশন

৮ অক্টোবর কলকাতার খিদিরপুরের ময়ূরভঞ্জ এলাকায় যে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়, তার ফলে বহু সাধারণ মানুষের বাড়ি ভাঙচুর হয়। প্রতিবাদে দলের খিদিরপুর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ১২ অক্টোবর একবালপুর থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, যেহেতু এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করেন, তাই ঘটনার শুরুতেই পুলিশের উচিত ছিল দল-মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষ ভাবে কঠোর হাতে হাঙ্গামা মোকাবিলা করা।

দাবি করা হয়, এলাকায় দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সরকারকে করতে হবে ও দোষী দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সেই সাথে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এলাকায় নিয়মিত ব্লিচিং ছড়ানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাঁকুড়ায় দুঃস্থ শিশুদের পোশাক বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ৯২ জন শিশুর হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। ইউনিয়নের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, প্রায় ২০০ জন কর্মচারী এই ত্রাণ কর্মসূচিতে সাহায্য প্রদান করেন, যার মধ্যে বহু আধিকারিকও আছেন। প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছা নিয়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। পোশাকের সাথে শিশুদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট ও ভাড়ার টাকাও দেওয়া হয়।

যাত্রীদের দাবি মানলেন স্টেশন কর্তৃপক্ষ

কলকাতার ঢাকুরিয়া স্টেশনে রেলব্রিজ ভাঙা থাকায় লাইন পারাপারে অসুবিধা হচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম নিচু হওয়ার কারণে ট্রেন থেকে ওঠানামা বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। এই অবস্থায় ঢাকুরিয়া নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ ও বাবুবাগান ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্বে এলাকার মানুষ সেপ্টেম্বর মাসে স্টেশনমাস্টারের কাছে ব্রিজ সারানো, প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা ও প্ল্যাটফর্মের জমা ময়লা পরিষ্কারের দাবিতে স্মারকলিপি দেন। কাজ শুরু না হওয়ায় আরও একবার তাঁরা স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান। এর পরেই স্টেশন কর্তৃপক্ষ দাবিগুলি দ্রুত পূরণ করে যাত্রীদের অসুবিধা দূর করেন।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কে বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদ

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের শেয়ার বিলগ্নিকরণের যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়েছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল। তিনি বলেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিরই অঙ্গ। শুধু ব্যাঙ্ক নয়, রেল, বিমা, বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাতের মতো ক্ষেত্রও বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। এতে আমানতের নিরাপত্তা থাকবে না। কর্মচারীরাও কাজ হারাবেন। তিনি এর বিরুদ্ধে আইডিবিআই-এর কর্মচারী সহ সকল অংশের মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

মিড-ডে মিলে মাথাপিছু ২০ টাকা বরাদ্দের দাবি

কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে প্রাথমিকে ৪৮ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭২ পয়সা। এই প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বঙ্গীয় প্রাথমিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, ক্ষুধা তালিকার শীর্ষে ভারত। প্রতি ৩ জন শিশুর ১ জন অপুষ্টিতে ভুগছে। করোনাকালে বহু ছাত্রছাত্রীর পরিবারের কাজ হারিয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে শিশুর খাদ্যের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারের বহন করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার ৭৫ বছরে অমৃত মহোৎসবের যাই ঢাক বাজাক না কেন সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং পুষ্টি নিয়ে আদৌ আন্তরিক নয়। তিনি মিড-ডে মিলে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে ন্যূনতম বরাদ্দ মাথাপিছু ২০ টাকা করার দাবি জানান। পাশাপাশি পৃথকভাবে গ্যাস বা জ্বালানির বরাদ্দ, ৫০ জনের কম ছাত্রযুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দের দাবি করেন তিনি।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের কালো মেঘ

ছয়ের পাতার পর

অভ্যন্তরে ক্যু ঘটানো, সশস্ত্র জাতিদাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া, যেসব দেশের শাসনকর্তারা আমেরিকার নির্দেশে উঠতে বসতে রাজি নয় তাদের গুপ্তহত্যা করা, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পুতুল সরকার বসানো— এ সবই আমেরিকার বহু পুরোনো কারবার। ১৯৯০ সালে যখন সংশোধনবাদী দেং নেতৃত্বাধীন চিন তাইওয়ান প্রণালীতে সামরিক মহড়া শুরু করে, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তৎক্ষণাৎ সেখানে যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন চিন একটি পুরোদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত এবং বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনীর অধিকারী হওয়ায় আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত। কাজেই বর্তমান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর সে সাহস দেখাচ্ছেন না। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকমাস ধরে তিনি বারবার বলছেন, তাইওয়ান আক্রান্ত হলে আমেরিকা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। আমেরিকা সারা বিশ্বের ৮৫টা দেশে ৭৫০টার মতো সেনাঘাঁটি এবং আটটা দেশে নৌঘাঁটি বানিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী চিনও বর্তমানে অন্য দেশে নৌঘাঁটি বানাতে শুরু করেছে। ২০১৭ সালে তারা তাদের প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি বানায় হর্ন অফ আফ্রিকার উপকূলের জিবুতিতে। এখন সে নিরক্ষীয় গায়নাতে আরও একটি নৌঘাঁটি বসানোর পরিকল্পনা করছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরটি চিন ইতিমধ্যেই ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়ে নিয়েছে এবং এই চুক্তির শর্তানুযায়ী লিজ আরও ৯৯ বছরের জন্য বাড়ানো যাবে। স্থানীয় স্তরে আধিপত্য বিস্তার না করতে পারলে কোনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আন্তর্জাতিক সুপারপাওয়ার হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং তাইওয়ান প্রণালীতে দুজনের মধ্যে কে দখলদারি কায়েম করতে পারবে তারই ওপর নির্ভর করছে তাইওয়ানের অর্থনীতি ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ চিন না আমেরিকা কার হাতে থাকবে।

বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনই কেবলমাত্র এই যুদ্ধ জিগিরকে রুখে দিতে পারে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রকৃত শাসক একচেটিয়া ও বহুজাতিক পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলোর নিজেদের মুনাফা লোটার উদগ্র লালসা চরিতার্থ করার জন্য, কোনও না কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ অজুহাতে বিশ্বের দেশে দেশে এইভাবে একটার পর একটা যুদ্ধ বাধানোর জঘন্য চক্রান্তের জেরে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষ মাত্রেই উদ্বিগ্ন। তাঁরা সকলেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান এবং তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে ঘনিয়ে ওঠা এই সংকটেরও অবসান চাইছেন। কেন না, বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ক্রমশই বেশি বেশি করে সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং তার দায়ভার বইতে হচ্ছে কোটি কোটি শোষিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে। কিন্তু শুধুমাত্র চাইলেই তা হবার উপায় নেই কারণ, মানবতার ঘৃণ্যতম শত্রু মুনাফালোভী একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের কাছে ভালো কথায় আবেদন নিবেদন করে কোনও ফল হবার নয়। পূর্বতন সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবির যতদিন ছিল, ততদিন তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তকে প্রতিহত করার ক্ষমতা নিয়ে একটা শক্তিশালী প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক শিবির অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন উত্তরোত্তর বল্গাহীন গতিতে বেড়ে চলেছে। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদেরও যুদ্ধবাধানোর অজুহাতের অভাব নেই। যে দেশকেই তারা দেখছে যে তাদের তাঁবে থাকতে রাজি নয়, সেখানেই যে কোনও অজুহাতে তারা আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি সবকিছু লঙঘন করে আগ্রাসন চালাচ্ছে, অসংখ্য নিরীহ জনসাধারণকে নির্মমভাবে হত্যা করছে এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম জঘন্য অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায়, সারা বিশ্বের বিপ্লবী দলসমূহের নেতৃত্বে শান্তিকামী মানুষদের সুসংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের এই যুদ্ধচক্রান্তকে রুখে দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে যেমন আছে উন্নত গণবিধ্বংসী অস্ত্র, দুনিয়াজোড়া শ্রমিকশ্রেণির ভাণ্ডারেও রয়েছে তাদের অমোঘ অস্ত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এ যুগের একজন অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠিত জঙ্গি শান্তি আন্দোলনই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকে কার্যকরীভাবে রুখে দিতে পারে। এইজন্যই পৃথিবীর দেশে দেশে সর্বস্তরের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রিয়, শান্তিকামী, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও গোষ্ঠীসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বজোড়া শক্তিশালী ও জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা বর্তমান সময়ের আশু প্রয়োজন। প্রকৃত কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের 'কোর' হিসেবে কাজ করবে এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। বিশ্বজুড়ে ঘনায়মান যুদ্ধ চক্রান্তের বিপদ থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এই দায়িত্ব আজ কমিউনিস্টদেরই গ্রহণ করতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

সরকারি কাজে ইংরেজির বদলে হিন্দি বিরোধিতা অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের

শিক্ষাদানের মাধ্যম সহ সরকারি কাজে ইংরেজি বাদ দিয়ে হিন্দি চালু করার যে প্রস্তাব সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি দিয়েছে, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অনুমোদন করেছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছে অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের সম্পাদক মানস জানা বলেন, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের। ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী দেশে একটি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আসলে দেশের ভাষা বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা এবং এই পদক্ষেপ অন্যান্য মাতৃভাষা সহ ধ্রুপদী ভাষাগুলির বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। জাতির ধারণাকে বিকৃত করে, জাত্যাভিমানের দোহাই দিয়ে আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করা কার্যত দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। এই প্রস্তাব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ চিন্তার বিকাশের সকল পথকে রুদ্ধ করবে। যখন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে ত্রি-ভাষানীতির কথা বলে কার্যত ইংরেজির গুরুত্ব হ্রাস করার পরিকল্পনা হয়েছে আমরা তখনই এর বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপতির কাছে অধ্যাপকদের স্বাক্ষর সংবলিত প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলাম। আমরা মনে করি, সরকারের এই ভাষানীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরে প্রতিবাদ সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

পুরুলিয়ায় শিশু-কিশোর উৎসব

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে সটরা বিদ্যাসাগর পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম শিশু-কিশোর উৎসব। পাঁচদিন ধরে চলা এই উৎসবে আড়শা, বলরামপুর সহ পুরুলিয়ার আরও কয়েকটি মহকুমার প্রায় দেড় হাজার শিশু-কিশোর খেলাধূলা ও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও মোবাইল-আসক্তি দূর করার ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজন উপলব্ধি করে

এলাকার মানুষ প্রবল উৎসাহে প্রতিনিধিদের জন্য চাল-ডাল সহ খাদ্যদ্রব্যের জোগান দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

সিপিডিআরএস-এর সাধারণ সভা

মানবাধিকার সংগঠন সেন্টার ফর প্রোটেকশন অব ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম-এর রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ঋত্বিক সদনের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অদিতিকুমার ধাওয়া। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডাঃ আলি হাসান প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সভাপতি বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত অনলাইন বক্তৃতায় দেশজুড়ে মানবাধিকার আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান রাখেন। মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র তাঁর বক্তব্যে মানবাধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে সিপিডিআরএস-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আধারে গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে তিনি সিপিডিআরএসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে সংগঠনের প্রতি গভীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। দুই শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বহরমপুরের রবীন্দ্র সদনে ১৮ সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত।

হিমাচল প্রদেশে মনীষী স্মরণ

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহিদ দিবস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মশতবর্ষ ও শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণে সেপ্টেম্বর জুড়ে হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় তিনটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ঋতু কৌশিক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে স্বার্থ জড়িয়ে সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের (এআইএআইএফ) সহসভাপতি মানিক মুখার্জী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, ইউক্রেনের মাটিতে আজ যে বিধ্বংসী যুদ্ধ চলছে তার শুরু রাশিয়ার আগ্রাসী আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই যুদ্ধটা আসলে দুই সাম্রাজ্যবাদী সুপার পাওয়ার রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কোভিড-১৯ মহামারীর বিপর্যয়ের ক্ষত থেকে মানবজাতির মুক্তিলাভের আগেই শুরু হয়েছে এই যুদ্ধ। দেখতে দেখতে তা ৯ মাসের বেশি সময় অতিক্রম করেছে। সীমাহীন ধ্বংসলীলা চলছেই।

এই ধ্বংসের থেকে একটু স্বস্তি দিতে পারে, এমন কোনও কিছুর চিহ্ন চোখে পড়ছে না। যুযুধান দুই দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধানের রাস্তা বার করতে কোনও আলোচনার সামান্য আশার রেখাটুকুও দেখা যাচ্ছে না। বরং যুদ্ধের গতি বেড়েই চলেছে।

একের পর এক দেশ ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহকারী দলে নাম লেখাচ্ছে। আমেরিকার নির্দেশে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি রাশিয়ার উপর একের পর এক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে চলেছে। অন্য দিকে রাশিয়া অল্প কিছু দেশের সমর্থন পাচ্ছে। চিন রাশিয়ার বিরুদ্ধতা করেনি। ভারত নিজ দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থে আপাত নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে চলছে। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে চিন এবং পাকিস্তানের সাথে মিলে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবের উপর ভোট দানে বিরত থেকেছে। নিরাপত্তা পরিষদেও ভারত ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবে ভোট দানে বিরত থেকেছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রচার থেকে অনেকে আশা করেছিলেন, উজবেকিস্তানের সমরখন্দে ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশনের শীর্ষনেতাদের বৈঠক যুদ্ধ বন্ধের কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু সেই বৈঠকে ভারত সহ কোনও দেশই সুনির্দিষ্টভাবে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি তোলেনি। এ বিষয়ে ভারতের মন্তব্যটি ছিল একেবারেই দায়সারা। বরং দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এই শীর্ষ বৈঠকের পর রাশিয়া ইউক্রেনে বোমাবর্ষণের তীব্রতা বাড়িয়েছে। আগের থেকে বেশি সংখ্যায় সাধারণ নাগরিক যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছেন।

এমনকি তারা কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকিও দিচ্ছে। সম্প্রতি তারা ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছে। এআইএআইএফ রাশিয়ার এই আগ্রাসী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছে। বাস্তব হচ্ছে, এই চলমান যুদ্ধের পিছনে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই স্বার্থ কাজ করছে।

সংকুচিত ও গভীর সংকটে দীর্ণ বিশ্ববাজারকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের যে তীব্র কাড়াকাড়ি চলছে, এই আগ্রাসী যুদ্ধ তারই ফল। যুদ্ধবাজ দেশগুলি যুদ্ধের জন্য যে আশু কারণ বা অজুহাতই দেখাক, এগুলো সবই তাদের আসল চেহারা এবং মতলব আড়াল করার ধূর্ত প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীর সব প্রান্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গায়ে হানাদার এবং নানা দেশের উপর অন্যায় দখলদারির ঘৃণ্য তকমা লেগে আছে। এ দাগ মোছার নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করার অজুহাতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের জোট হিসাবে ন্যাটোর সৃষ্টি। তারা এখন হিংস্র শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে এবং একের পর এক দেশে সামরিক হামলা চালাচ্ছে। সমাজতন্ত্র ধ্বংসকারী প্রতিবিপ্লবের পর রাশিয়া আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত নিয়মের কারণেই তীব্র বাজার সংকট থেকে তার রেহাই মেলেনি।

এই সংকটের মোকাবিলা করতে বিশ্ববাজারের বড় অংশের ভাগ পাওয়ার জন্য রাশিয়াকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ন্যাটোর সঙ্গে বাজার দখলের লড়াইতে নামতে হয়েছে। ফলে ১৯৯০-এর পর থেকে বিশ্বে একটা নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যার একপক্ষে রাশিয়া-চিন, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কখনও তা ছোটখাট বিবাদ কখনও বড় যুদ্ধে ফেটে পড়ে।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বাঁচার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ বাধানো এবং যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরি করা ছাড়া আর রাস্তা নেই। কারণ অর্থনীতির সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব সৃষ্টি করতে না পারলে তার জং ধরা উৎপাদনব্যবস্থার চাকাটাকে গড়ানো যাবে না। এতে লাভবান হয় সব দেশের ধনকুবের, সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিপতি এবং যুদ্ধব্যবসায়ীরা। অন্য দিকে সব স্তরের জনসাধারণের দুর্দশা চরমে ওঠে। জীবন, জীবিকা, আশ্রয়, খাদ্য সহ সমস্ত কিছু হারিয়ে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তানের মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জনগণ আজ চরম দুর্দশার গ্রাসে। এবার পালা ইউক্রেনের। এটাই শেষ নয়। ধনকুবেরদের সিন্দুক যত ভরে উঠছে, ততই সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদের সংকট নিরসনে বাধানো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য সাধারণ মানুষ কেন এত মূল্য দেবে?

বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ হিসাবে আজ আমাদের সকলের কর্তব্য যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়া। রাশিয়ার আগ্রাসন এবং ন্যাটো-মার্কিন উস্কানির অবসান চেয়ে দাবি তোলা আজ কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্তরকমের যুদ্ধ প্রচেষ্টার আমরা দৃঢ় বিরুদ্ধতা করছি। আসুন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা ও ন্যাটো ভেঙে দেওয়ার দাবিতে আমরা সকলে সোচ্চার হই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com